সমকাল

তারিখ 18 JAN 2016
পৃ ৯ কলাম ১

সংকটের উচ্চশিক্ষা

সমকালীন প্রসঙ্গ | আরিফুল কবির

সহযোগী অধ্যাপক, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সম্প্রতি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অচলাবস্থা তৈরি হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে এ সংকটের মূলে সম্প্রতি সরকার ঘোষিত অষ্টম বেতন কাঠামোতে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মর্যাদার অবনমন এবং শিক্ষকদের প্রচলিত সুযোগ-সুবিধাবঞ্চনা। অনেকেই শিক্ষকদের এই বঞ্চিত অবস্থার জন্য সরকারের অতি আমলানির্ভর অবস্থাকে দায়ী করছেন। সরকারের উচ্চ পর্যায় থেকেও শিক্ষকদের প্রতি অনমনীয় মনোভাব পোষণ করা হচ্ছে। অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে এ কথা বলা যায়, হয়তোবা এ সংকট শিগগিরই কেটে যাবে। কিন্তু পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সংকট সেটা কি শুধুই শিক্ষকদের মর্যাদার সংকট, নাকি এর বাইরেও অন্য কিছু? আমার মনে হয়, এ বিষয়ে ভাবনার অনেক অবকাশ রয়েছে।

এর জন্য আমাদের আধুনিক ও পাশ্চাত্য উচ্চশিক্ষার ঐতিহাসিক সামাজিক-অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত জানার চেষ্টা করেছি এবং দেখেছি, কীভাবে সে সময়কার ব্রিটিশ রাজনীতির কূটকৌশল প্রায় শত বছর পরেও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিদ্যমান। অনেকেই জানি, পূর্ববঙ্গ তথা আজকের বাংলাদেশে আধুনিক ও পাশ্চাত্য উচ্চশিক্ষার গোড়াপত্তন হয়েছিল ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। অবশ্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পূর্বে বিভিন্ন কলেজের মাধ্যমে এ অঞ্চলে উচ্চশিক্ষা প্রদান করা হতো। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত এসেছিল মূলত রাজনৈতিক ক্ষতিপূরণ হিসেবে। ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ পূর্ববঙ্গের জনগোষ্ঠীর মধ্যে চরম অসন্তোষ তৈরি করেছিল। ব্রিটিশ শাসক ভারতবর্ষে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা তৈরি ও ব্রিটিশ শাসনকে দীর্ঘায়িত করতে বঙ্গভঙ্গ রদের রাজনৈতিক ক্ষতিপূরণ হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিল।

যদিও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও জাতিগোষ্ঠী বিভিন্ন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে মূলত জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা এবং দেশের সামাজিক-রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য; কিন্তু বাংলাদেশে আধুনিক উচ্চশিক্ষার গোড়াপত্তন হয়েছিল মূলত উভয় বাংলার মুসলিম ও হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে পুনর্মিলন ও পূর্ববঙ্গের জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক ক্ষতিপূরণের অংশ হিসেবে। ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী নিজেদের স্বার্থে প্রতিষ্ঠার শুরুতেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে রাজনৈতিক রূপ প্রদান করেছিল। তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই রাজনৈতিক চরিত্র পূর্ববঙ্গীয় বিদ্যোৎসাহী গোষ্ঠী তৈরিতে সহায়তা করেছিল। ফলে বাংলাদেশের ইতিহাসের প্রতিটি স্তরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের এই রাজনৈতিক চরিত্র ধারণ আমাদের বাংলাদেশ নামক একটি স্বাধীন দেশ প্রতিষ্ঠায় নিয়ামকের ভূমিকা পালন করেছিল। এমনকি মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী সময়েও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন স্বৈরাচারবিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল। কিন্তু মুক্ত-স্বাধীন দেশে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়কে জ্ঞানচর্চা, বিতরণ ও সামাজিক-অর্থনৈতিক বিকাশের কেন্দ্রে পরিণত করার যে চেষ্টা, সেটা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা ও সরকারের পক্ষ থেকে অবহেলা করা হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে (ড. কুদরাত-এ-খুদা কমিশন-১৯৭৪) শিক্ষা ব্যবস্থাকে অ-ঔপনিবেশিক রূপ দেওয়ার লক্ষ্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। যেমন, মাতৃভাষার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা প্রদান কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়কে মুক্তবুদ্ধি চর্চার কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার সুপারিশ করেছিল। যে কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন ও শিক্ষকদের একাডেমিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়েছিল। কিন্তু ব্রিটিশ ও পাকিস্তানি শাসকদের বেশ কিছু নীতি স্বাধীন বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা নীতিতে খুব সূক্ষ্মভাবে বিভিন্ন উপায়ে ও পথে নিয়ে আসা হয়েছে, যাকে অনেক স্কলার পলিসি বুনন হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। যেমন 'পাকিস্তানি আমলে' প্রদেশের গভর্নরকে বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর করা হয়েছিল। অনেকটা পাকিস্তানি আমলের

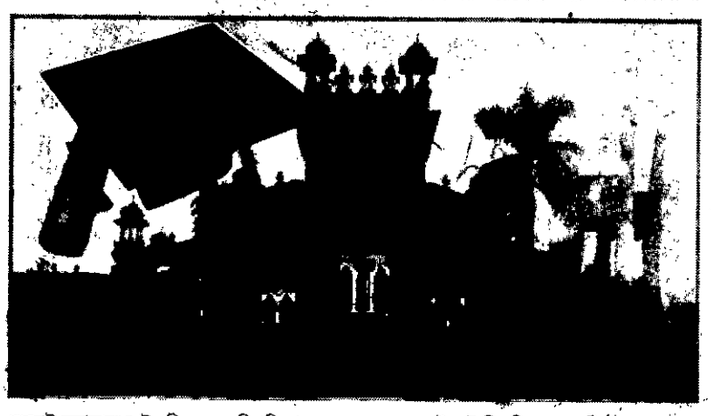

মতোই মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে সব বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর হিসেবে বিবেচনা করা। যদিও আপাতদৃষ্টিতে চ্যান্সেলর হিসেবে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ সম্মানিত নাগরিককে পাওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য গৌরবের ছিল এবং মহামান্য চ্যান্সেলরের বিশ্ববিদ্যালয়ে দৈনন্দিন কোনো কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হতে হয় না; কিন্তু এ প্রক্রিয়ার মধ্যে এক ধরনের রাজনৈতিক ক্ষমতা সম্পর্ক বিদ্যমান। অন্যদিকে স্বাধীনতা-পরবর্তী, বিশেষ করে সামরিক সরকারগুলো পাকিস্তানি শাসকদের মতোই বিশ্ববিদ্যালয়কে তাদের প্রতিপক্ষ হিসেবে বিবেচনা করেছিল। কারণ সামরিক সরকারগুলো তাদের পূর্বতন পাকিস্তানি সামরিক সরকারের অভিজ্ঞতা থেকে এটা বুঝতে পেরেছিল– একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় তাদের ক্ষমতা কাঠামোকে চূর্ণ করতে পারে। এ ধরনের ভীতি সামরিক সরকারগুলোকে তাড়িত করেছিল এবং তা মোকাবেলায় পূর্বতন সামরিক সরকারের নীতিই তারা অনুসরণ করেছিল। ফলে পেশিশক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে এবং পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে নানা ভ্রান্ত ধারণা তৈরি করে বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছিল। অন্যদিকে, বিশেষ করে '৯০ দশকের শেষদিকে সামরিক ও বেসামরিক আমলা, ব্যবসায়ী এবং পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় ক্ষমতাশালী অধ্যাপক পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে নানা ধরনের ডিসকোর্স তৈরি করেছিলেন। যেমন, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় রাজনীতি ও ছাত্র সংঘাতের কেন্দ্র কিংবা এখানকার শিক্ষকরা ক্ষমতামুখী এবং ক্লাসরুমবিমুখ কিংবা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান কমে যাচ্ছে। এ ধরনের ডিসকোর্সের মূলে ছিল প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংকটকে পুঁজি করে এ দেশে উচ্চশিক্ষার বিকল্প যাত্রা শুরু হয়েছে। কিন্তু সর্বজন বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সংকট, তা দূর করতে কোনো সুনির্দিষ্ট সমাধান তারা দেননি। পরবর্তী সময়ে আমরা দেখেছি, যেসব ক্ষমতাশালী ব্যক্তি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে এ ধরনের ডিসকোর্স তৈরি করেছেন, তারা সবাই কোনো না কোনো প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং অনেকেই প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিকও হয়েছেন। কিন্তু সামরিক সরকারের নীতি ও অভিজাত গোষ্ঠীর পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়বিরোধী প্রচারণা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থাকে নানাভাবে ক্ষতি করেছে।

প্রথমত, যেহেতু সরকারি অর্থের অপ্রতুলতা ছিল, সে কারণে সরকার উচ্চশিক্ষার অধিক সুযোগ তৈরিতে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারণা বাস্তবায়ন করতেই পারে। কিন্তু যেসব ব্যক্তি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারণা তৈরি ও সরকারকে প্রভাবিত করেছেন তাদের অনেকেই ব্যক্তিগত স্বার্থ সংরক্ষণে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়কে ব্যবহার করেছেন। ফলে সরকার এক ধরনের নয়া উদারনীতির 'বিকৃত' রূপ উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে গ্রহণের সুযোগ পায়। এই বিকৃত-উদারনীতির মূল লক্ষ্যই হলো প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নামে প্রাইভেট হলেও সেখানে, যেটাকে Michel Foucault বলেছেন, 'bi-power'-এর মাধ্যমে সরকারের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা। Foucault-এর ধারণামতে, bi-power' হলো আধুনিক রাষ্ট্রযন্ত্র দৈনন্দিন কার্যপ্রণালি ও প্রক্রিয়া বিভিন্ন কলাকৌশল উদ্ভাবন করে, যার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং জনগোষ্ঠীকে নিয়ন্ত্রণ করে। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে যে প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, সেটা তারই প্রতিফলন মাত্র। দ্বিতীয়ত, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরূপ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা যেখানে সরকারের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকবে, কিন্তু সরকার ধীরে ধীরে উচ্চশিক্ষার আর্থিক দায়িত্ব ছাত্র ও অভিভাবকদের কাঁধে চাপিয়ে দেবে। এ ধারণার ওপর ভিত্তি করে ২০০৫ সালে বেশ কিছু পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাও হয়। কিন্তু ছাত্র আন্দোলনের মুখে বর্তমান সরকার ওইসব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনে পরিবর্তন এনে সরকারি অনুদান অব্যাহত রেখেছে। ২০০৫-এর পরবর্তী সময়ে যত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, সেখানে একদিকে যেমন সরকারের কর্তৃত্ব অনেক বেশি নিশ্চিত করা হয়েছে, অন্যদিকে উচ্চশিক্ষা ব্যয়ের একটি বড় অংশ ছাত্র ও অভিভাবকদের ওপর চাপানো হয়েছে।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, এই 'bi-power' ধারণার ওপর ভিত্তি করে বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকার ও ক্ষমতাশালীদের একচ্ছত্র অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। তৎকালীন সামরিক শাসক যে কাজটি করতে পারেননি, ৯০-এর পরবর্তী প্রত্যেকটি গণতান্ত্রিক সরকার ধীরে ধীরে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক ও ছাত্রদের একটি অংশকে ক্ষমতা কাঠামোর অংশীদার করার মাধ্যমে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর সরকার ও ক্ষমতাশীলদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে গণতান্ত্রিক সরকার ও ক্ষমতাশালীদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে সরকারের লাভ কী? এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে ঠিক যে কারণে ব্রিটিশ শাসকরা এ দেশে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিল কিংবা ঠিক যে কারণে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের চেয়ে অনেক বেশি সুযোগ-সুবিধা আমলাদের জন্য নিশ্চিত করেছিল। তাই আপাতদৃষ্টিতে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সংকট সেটাকে শিক্ষকদের মর্যাদা কিংবা শিক্ষক ও আমলাদের দ্বন্দ্ব মনে হলেও এটা আসলে সংকটের উপরিভাগ মাত্র। যেসব শিক্ষক আজকে আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাঁদেরকে বুঝতে হবে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বললেই বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান সংকট কেটে যাবে, সেটা হয়তো ঠিক, কিন্তু তা সংকটের গভীরতাকে বিন্দুমাত্র স্পর্শ করবে না, যেমনটা আমরা ইতিহাসের বিভিন্ন সন্নিকটে দেখেছি। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে সত্যিকারের একাডেমিক চর্চার গণকেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে না পারলে এ জাতীয় সংকট ঘুরেফিরে আসবে। তখন শুধু বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে কেরানি তৈরির কারখানা ব্যতীত অন্য কিছু ভাবার অবকাশ থাকবে না। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সত্যিকারের একাডেমিক গণকেন্দ্রে রূপান্তরের দায়িত্ব সমাজের সর্বস্তরের জনগোষ্ঠীর হলেও, মূল দায়িত্ব পালন করতে হবে এখানকার শিক্ষকদের, যেমনটি করেছিলেন পূর্বসূরিরা। ক্ষমতাবানরা চাইবেন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে তাদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে; কিন্তু একাডেমিকদের দায়িত্ব হলো কূট-রাজনীতি বিষয়ে সজাগ থাকা এবং স্বাধীন একাডেমিক চর্চাকে চালিয়ে নেওয়া, যা সমাজ ও রাষ্ট্র উন্নয়নে মুখ্য ভূমিকা রাখবে। কিন্তু একাডেমিকদের কেউ কেউ যদি ওই কূট-রাজনীতির অংশ হয়ে যান, তাহলে শিক্ষকদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াই হয়তোবা কেউ কেউ করবেন; কিন্তু উচ্চশিক্ষার সংকট কখনোই কাটবে না।